কৃষ্টি

জাকির হুসেন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইভনিং কলেজ পত্রিকা

পঁয়তাল্লিশ বর্ষ

২০১১ / ১৪১৭

Kristhi

সম্পাদক মণ্ডলী

মুন্সী মহম্মদ ইউনুস — বন্দনা হাটি

সেখ মোফাজ্জাল হোসেন — মহম্মদ আজাদ

Laser Compose & Printed by
Sucharu Enterprises
37/4083 Vishnu Mandir Marg
Karol Bagh, New Delhi - 5
Tel. : 9811329479, 7838230170, 45642838
Published by : Mr. S. A. Hamidin, Principal
Zakir Husain Post Graduate Evening College
Jawaharlal Nehru Marg
New Delhi - 110 002

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫
জাকির হুসেন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইভনিং কলেজ
বাংলা সাহিত্য গোষ্ঠী সংবাদ ৬
'গোরা'র বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ঃ আজকের
প্রেক্ষিতে - সেখ মোফাজ্জাল হোসেন ৭
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প - বন্দনা হাটি ১০
দৃষ্টিহীনদের সাহিত্য ও
সাহিত্যে দৃষ্টিহীন - শাশ্বতী অধিকারী ১৩
আত্মজীবনী তসলিমা - সমর্পিতা মাইতি ১৯
দয়রামপুরের লোকসংস্কৃতিতে
পদ্মানদীর প্রচার - রুবিয়া খাতুন - ২৩
আমার বেড়াল 'নোনী' - রফিকা ২৭
ইন্সানিয়াত্ - নবেন্দু সেন ৩০
পারমিতা চক্রবর্তী'র কবিতা :
ট্রেনিং ৩১
পরম্পরা ৩১
আত্মচরিত ৩১
দাম্পত্য ৩১
আরশিনগর ৩২
অপর্ণা আচার্য'র ছয়টি কবিতা :
আগুনকে ঢুকতে দিইনি - ৩৩
জাল্লিকাট্টু উৎসব - ৩৩
পাহাড়ে হাসির শব্দ - ৩৩
স্বচ্ছ চোখ ভাসছে - ৩৩
আমাকে শব্দ দাও - ৩৪
পালাবি কিনা বল - ৩৫
ইউনুসের দুইটি কবিতা :
হিমনগর - ৩৬
ফাল্গুনের পাখিরা - ৩৭

‘গোরা’র বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ঃ আজকের প্রেক্ষিতে

সেখ মোফাজ্জাল হোসেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশিত হয়েছে। জীবনরসিক এই সাহিত্যিকের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। ‘গোরা’-র মহাকাব্যিক বিস্তৃতির মধ্যেও তাই ফুটে উঠেছে। এটি রচিত হয় ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে, কিন্তু এতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সময়কাল তিরিশ বছর আগের আনুমানিক ১৮৭৮-১৮৭৯ সাল। সময়ের বিচারে এটিকে নিকট কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন উজ্জ্বল কুমার মজুমদার। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে একবিংশ শতকের ব্যস্ত জীবন যাত্রার ফাঁকে পাওয়া স্বল্প অবকাশে কেন কেউ এই বৃহদাকার উপন্যাস পড়বেন, যা কিনা উনবিংশ শতকের বাঙালী জীবন নিয়ে রচিত। কেবল রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই পড়ব, এমন অন্ধ আনুগত্য যেমন আজকের দিনে বিরল, তেমনি পড়ার জন্যেই পড়ে নেব এমন পাঠকও আজ হাতে গোনা। উত্তর হতে পারে যে উপন্যাস হিসেবে এটি একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। কিন্তু এটুকু বলে থেমে গেলে উপন্যাসটির সম্বন্ধে মত প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এই মহাকাব্যিক উপন্যাসে রয়েছে কাহিনির অধিক উদ্ধৃতাংশ যা একে দিয়েছে বর্তমান সময় ও পরিসরে প্রাসঙ্গিকতা। মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ‘গোরা’র মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন দেশপ্রেম, যা মূলত দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা আর শেষ পর্যন্ত এ সব ছাড়িয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ যা ছিল আমাদের সনাতন ভারতবর্ষের মন্ত্র — ‘বসুন্ধরা কুটুম্বকম্’।

উপন্যাসের নায়ক গোরার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল দেশপ্রেম। কিন্তু তা কেবলমাত্র এক দেবীমূর্তির পূজা নয়। সে ‘ঘরে-বাইরে’-র সন্দীপের মতো দেশ জননীর কথা বলে না। তার কাছে দেশের মানবগোষ্ঠীই দেশ। তাদের প্রতি তার আগ্রহ, ভালোবাসাটাই তার দেশপ্রেম। তাই—

> “যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সংকোচ, সমস্ত পূর্বসংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, ‘আমি তোমাদের, তোমরা আমার।” (পৃঃ ৬২৮)

এই কারনেই সে গরীব মুসলমান ডিমওয়ালাকে সাহায্য করতে ছুটে যায়, চরঘোষপুরের মানুষের জন্যে কারাবরণ করে। ছুতোর কামারদের নিয়ে সে খেলাধূলার দল গড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে ছিল এক বড়ো অসঙ্গতি। সে বলতে চায় ‘আমি তোমাদের তোমরা আমার’, কিন্তু সে জাতপাতের বাছবিচার মেনে চলে। সে লছমিয়ার ছোঁয়া জল খায় না, নাপিতের বাড়িতে নিজের হাতে ঘটি মেজে জল খায়। সে ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হতে চায় অথচ ব্রাহ্মদের জাতিভেদহীনতার আদর্শকে তার মনে হয় প্রতীচ্যের অন্ধঅনুকরণ। তার ধারনায় দেশের প্রতি আনুগত্য আর সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আনুগত্য এক ছিল। যে খোলসের সীমায় সে হাঁপিয়ে উঠছিল, কিন্তু পরিত্রাণের পথ পাচ্ছিল না। এ সমস্ত অসঙ্গতির যন্ত্রনায় গোরা দীর্ণ হয়েছে। উপন্যাসটি জুড়ে গোরা এই অসঙ্গতি থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই যাত্রাপথেই এসেছে সুচরিতার

প্রতি ভালোবাসা। দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রথমে নারীর প্রতি প্রেমের সংঘাত হলেও পরে সে খুঁজে পেয়েছে সমন্বয় সূত্র। তার জন্মরহস্যের উদঘাটন তাকে তার জীবনের অসঙ্গতি থেকে উত্তরণের পথে সাহায্য করেছে সত্য, কিন্তু এ উত্তরণ আকস্মিক নয়, তার প্রচেষ্টাই তো ছিল ভারতবর্ষকে সম্যক উপলব্ধির, তার যাত্রাই তো ছিল ভারতবর্ষের দেবতার সন্ধানে যাত্রা। যাত্রার প্রারম্ভেই সে উপলব্ধি করেছিল দেশ কেবল নির্দিষ্ট সীমা বিশিষ্ট ভূখণ্ড নয়। দেশ গড়ে উঠে দেশবাসীকে নিয়ে। দেশকে ভালোবাসতে চাইলে দেশবাসীকে ভালো বাসতে হবে। তবু তখন ছিল সে হিন্দু, ভারতবর্ষীয় নয়। যাত্রাপথের শেষে সে উপলব্ধি করেছে জাতপাতের বিচার না করা আনন্দময়ীর মধ্যেই লুকিয়ে আছে যথার্থ ভারতবর্ষের কল্যাণ মূর্তি। সে প্রাণ খুলে বলতে পেরেছে সে ভারতবর্ষীয়। পরেশবাবুর কাছে সে তার নবউপলব্ধি তাই বর্ণনা করেছে এ ভাবে–

> "আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি– ....কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারিনি– এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি– কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারিনি। সে জন্য আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূণ্যতা ছিল। এই শূণ্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি – এই শূণ্যতার উপরে নানারকম কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরো বিশেষ রূপ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি। ....আজ সেই সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশবাবু।"
>
> (পৃঃ ৮৯৪)

সে আরো বলেছে –

> "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই – যাঁরা মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না –যিনি কেবলই হিন্দু দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

গোরার এই উপলব্ধি আসলে তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরই মত। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের নানা বিকৃতি, জাতিদাঙ্গা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বিভিন্নভাবে তিনি তাই দেশবাসীকে জানাতে চাইছিলেন সবার পরশে পবিত্র না হলে দেশ জননীর অভিষেক অসম্পূর্ণ থাকবে। 'গোরা'-র সমসময়ে রচিত 'গীতাঞ্জলী'র দু'তিনটি গানে একইভাব ব্যক্ত হয়েছে। আবার তেমনি 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩১৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন –

> "ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে স্পন্দিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয় সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে।"

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে এখানে আর দ্বন্দ্ব যাকে না ব্যক্তির প্রতি প্রেম অথবা সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রতি ভালোবাসা। তাই গোরার সুচরিতার প্রতি ভালবাসার সঙ্গে দেশ হিতৈষী সাধনার আর বিরোধ থাকে না। ভারতবর্ষের যে কোনো জাতির মানুষের অন্নে জাত যাওয়ার ভয় থাকে না। ইংরেজ দেখলে তার মনে প্রথমে ভালোমন্দ নির্বিশেষে যে বিদ্বেষভাব জাগত – তাও যখন জাগে না, তখন বোঝা যায় তার উগ্র জাতীয়তাবাদ মুছে গেছে – সে সর্বজাতীয়, আবার তা সত্ত্বেও মনে প্রাণে ভারতীয়।

আজকের এই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্যর্থতার উল্লেখ করেছিলেন 'তপোবন' প্রবন্ধে তা প্রমাণিত। আজও আমরা সবাইকে ভালোবেসে আপন করে নিতে পারিনি। তাই আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে উঁচু জাত নিচু জাতের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। আজও অপমানিত, দীনের থেকে দীনদের ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ জন্ম দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদের। ধর্মীয় মৌলবাদের বলি হয়ে প্রত্যেকবছর অল্পবিস্তর মানুষ প্রাণ হারায়। আর কেবল ভারতবর্ষেই তো নয় এ সমস্যা বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে। তাই রবীন্দ্রনাথের দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। আর উপন্যাসের মত জনপ্রিয় সাহিত্যমাধ্যমে যখন এই দর্শন উঠে আসে তখন তা সহজে অনেকের কাছে পৌঁছে যায়। এখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য কাজটি হল, কেবল আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গোরার উপলব্ধিকে নিজেদের মধ্যে অনুভব করে তাকে বাস্তবায়িত করে তোলা। এই পণ্যায়ন মৌলবাদ আর জাতিদাঙ্গা বিদ্ধস্ত বন্ধুর পথে আমাদের যাত্রায় 'গোরা'-র বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, স্বদেশপ্রেম যোগাবে—পথের আলো।